দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

সার-সংক্ষেপ

২৯ মে ২০২৪

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক- গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণায় কারিগরি সহায়তা

মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. মাহ্‌ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মো. নেওয়াজুল মওলা, *রির্সাচ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মো. সাজেদুল ইসলাম, *ডাটা এনালিষ্ট, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহকারী

নিথরা মেহরাব, নুসরাত তাসনিম প্রমি, মো. রাশেদ খান, ফাতিমা তানজীম

কৃতজ্ঞতা: গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগ, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের কোঅর্ডিনেটর মো. আতিকুর রহমানসহ এই বিভাগের মাঠ পর্যায়ের সহকর্মীদেরকে যাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও মতামত দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, ও অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এবং টিআইবি'র নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, প্রতিবেদনটির সার্বিক পর্যালোচনা ও সম্পাদনায় সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএসআরটি'র প্রাক্তন অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব। তার সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমরা তার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতিবেদনটি সম্পাদনা এবং মূল্যবান মতামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। এছাড়া, এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে জড়িত সহকারি ফিল্ড এন্যুমেরেটরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বশেষ, বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল মুখ্য তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৪

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক ১৯৯০-এর দশক-পরবর্তী বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এয়াড়া, নির্বাচন ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক ও শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সংস্কারসহ সংশ্লিষ্ট আইন বিভিন্ন সময় সংশোধন করা হয়। এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে নানা ধরনের অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ নির্বাচন পরিচালনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিতর্কিত ভূমিকা পালন এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে বিবিধ চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয় (টিআইবি ২০০৭, ২০০৯, ২০১৮)।

বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বারবার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) এর বিতর্কিত সংশোধন, রাজনৈতিক দল ও পর্যবেক্ষক নিবন্ধনে বিতর্কসহ নির্বাচন ব্যবস্থায় দুর্বলতার কারণে দেশের মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম-প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তা ট্র্যাকিং করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন এবং নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতে প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা;
- নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজন কর্তৃক নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালন পর্যালোচনা করা; এবং
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, কমিশনের কর্মকর্তা, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক, ভোটার, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।
- নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা জরিপ

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়ন: দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৫০টি নির্বাচনী আসন নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেক আসনে প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস: গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। সংবাদ-মাধ্যম পর্যবেক্ষণ করতে সর্বাধিক প্রচারিত দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা ও দুইটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এবং টেলিভিশনে প্রাইম নিউজ এর সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিটিভি (রাত ৮টার সংবাদ) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় প্রথম দুইটি ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি: এ গবেষণার আওতার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ও নির্বাচনকালীন ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস অর্থাৎ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ ও তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার সময়: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই গবেষণায় জুন ২০২৩ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ২২ মে ২০২৪ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ ও এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. গবেষণাভুক্ত নির্বাচনী আসনের তথ্য

প্রথমে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি আসন থেকে ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় আটটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি জেলার ৫০টি আসন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রংপুর বিভাগের দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা; রাজশাহী বিভাগের বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ; খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা; বরিশাল বিভাগের বরগুনা, ভোলা, বরিশাল ও পিরোজপুর; ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা; ঢাকা বিভাগ থেকে টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ; সিলেট বিভাগে সুনামগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভিবাজার; এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য বান্দরবান জেলার আসনগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগ থেকে সবচেয়ে বেশি ১১টি আসন এবং সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগ থেকে তিনটি করে আসন বাছাই করা হয় (চিত্র ২)।

চিত্র ১: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় এলাকার সংখ্যা

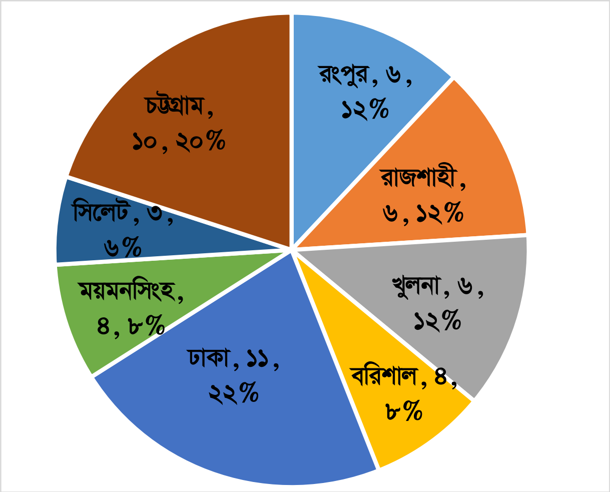

চিত্র ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনভুক্ত জেলাসমূহ

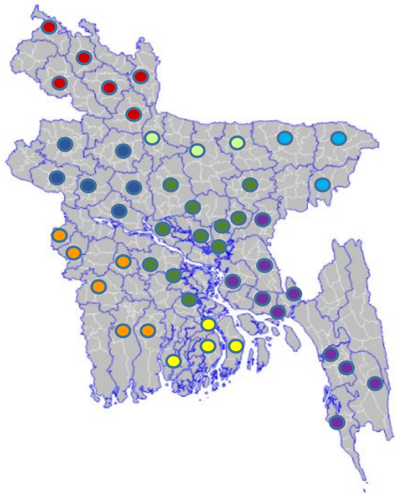

সারণি ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি নির্বাচনী আসন, ৮টি বিভাগ ও ৪১টি জেলা

	বিভাগ	সংসদীয় আসন সমূহের নাম
●	রংপুর	দিনাজপুর-২, নীলফামারী-১, রংপুর-১, রংপুর-৪, কুড়িগ্রাম-৩, গাইবান্ধা-৪
●	রাজশাহী	বগুড়া-৬, নওগাঁ-২, রাজশাহী-৩, নাটোর-১, নাটোর-৪, সিরাজগঞ্জ-৬
●	খুলনা	কুষ্টিয়া-১, ঝিনাইদহ-৪, যশোর-৩, বাগেরহাট-১, খুলনা-৩, সাতক্ষীরা-৪
●	বরিশাল	বরগুনা-১, ভোলা-৩, বরিশাল-৩, পিরোজপুর-৩
●	ময়মনসিংহ	জামালপুর-২, ময়মনসিংহ-৩, ময়মনসিংহ-৮, নেত্রকোণা-৫
●	ঢাকা	টাঙ্গাইল-২, মুন্সীগঞ্জ-৩, ঢাকা-৬, ঢাকা-১০, ঢাকা-১২, ঢাকা-১৮, গাজীপুর-৩, নারায়ণগঞ্জ-৪, রাজবাড়ী-১, ফরিদপুর-৪, গোপালগঞ্জ-২
●	সিলেট	সুনামগঞ্জ-৩, সিলেট-৪, মৌলভীবাজার-৩
●	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩, কুমিল্লা-৩, কুমিল্লা-৫, চাঁদপুর-৩, লক্ষ্মীপুর-৪, চট্টগ্রাম-৫, চট্টগ্রাম-৭, চট্টগ্রাম-১১, কক্সবাজার-৩, পার্বত্য বান্দরবান

৫. ১৯৯১ পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো পূর্বের জাতীয় নির্বাচনগুলোতে পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। যেমন, ১৯৯৬ সালে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনে বিএনপির অবস্থান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে আওয়ামী লীগের আন্দোলন, এবং ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল, নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণে ১৯৯১-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ যা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২: নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং স্ববিরোধিতা

সাল	প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ
১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে আওয়ামী লীগের আন্দোলন; বিরোধীতা সত্ত্বেও ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন আয়োজন; ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিএনপি সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত; সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
২০০১	দলীয় অনুগত বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে পেতে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি করে বিএনপি সরকারের সংবিধান সংশোধন; এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলন; ২০০৬ সালে রাজনৈতিক সঙ্কট, ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন
২০০৭-২০০৮	রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ; সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর ক্ষমতায় থাকা; নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত; রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ, সকল দলের অংশগ্রহণে ২০০৮ সালে নির্বাচন
২০১১	তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন; সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক পদ্ধতিটি বাতিলের উদ্যেগ গ্রহণ; তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সম্পর্কিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল; সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে এবং সংসদ বহাল রেখে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান; বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা

সারণি ৩: নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

সাল	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচন কমিশন
২০১৪	নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন; দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা; নির্বাচন বর্জন; হরতাল-অবরোধ-সহিংসতা	সরকার প্রধানের নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন ও বিরোধী দল ছাড়াই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন; ১৫৩টি আসনে বিনাভোটে জয়লাভ	সংলাপের আয়োজন না করা; ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক অবস্থান গ্রহণ; হরতাল-অবরোধ-সহিংসতার মধ্যে নির্বাচন আয়োজন; অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগীতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে ব্যর্থতা; নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকা
২০১৮	দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ- ৬টি আসন প্রাপ্তি; নির্বাচন কমিশনের ওপর অনাস্থা; কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা	সংবিধান মেনে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থান; নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার গঠন	সংলাপ আয়োজন ও বিরোধীদলগুলোকে নির্বাচনে আনা; ইভিএম ব্যবহারে আরপিও সংশোধন এবং বিতর্ক; নির্বাচনে সব দলের সমান প্রতিযোগীতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে না পারা; অনিয়ম, কারচুপি ও রাতে ভোট গ্রহণের অভিযোগ

সাল	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	নির্বাচন কমিশন
২০২৪	সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনসহ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি মানলে তবেই আলোচনা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অবস্থান	রাজনৈতিক বিরোধীদের সাথে সংলাপ ও সমঝোতা না করা; দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন আয়োজনে অনড় অবস্থান; মনোনীত প্রার্থীর পাশাপাশি দলীয় ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো	বিরোধী দলগুলোর সাথে কোনো এজেন্ডা ছাড়া সংলাপ আয়োজন- বিএনপিসহ ১৮টি দলের প্রত্যাখ্যান; নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে সম্ভাব্য আইন সংস্কারের প্রস্তাব প্রদান না করাসহ বিরোধীদের নির্বাচনে আনতে কমিশনের কিছু করার নেই বলে সরকার সহায়ক অবস্থান গ্রহণ

৬. তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সমূহকে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তিনটি ধাপে ভাগ করে - প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনকালীন সময় ও নির্বাচন-পরবর্তী সময় বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক ধাপেই নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৪: তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

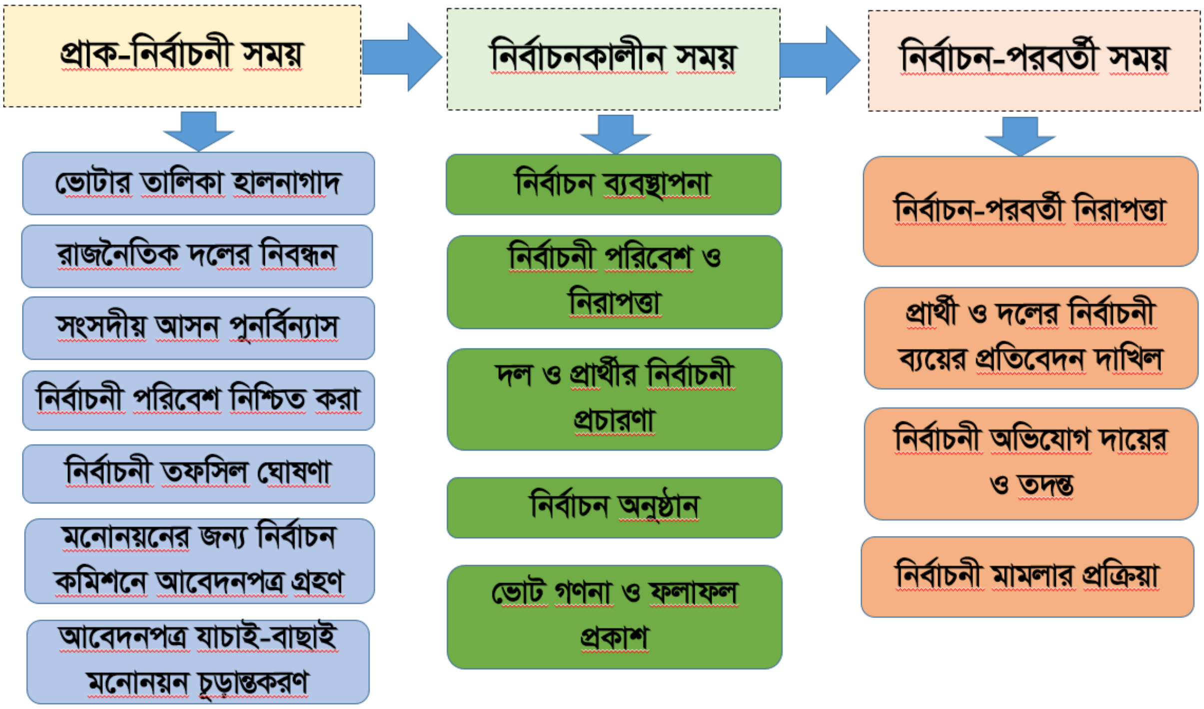

গবেষণার ফলাফল

৭.১. প্রাক-নির্বাচনী সময়: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

ভোটার তালিকা হালনাগাদ: ২০২২ সালের ১৯ মে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু হয়। সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, সারা দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৭ জন। বিগত পাঁচ বছরে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় ভোটার বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ এবং ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

চিত্র ৩: সর্বশেষ বারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনভেদে ভোটার সংখ্যা

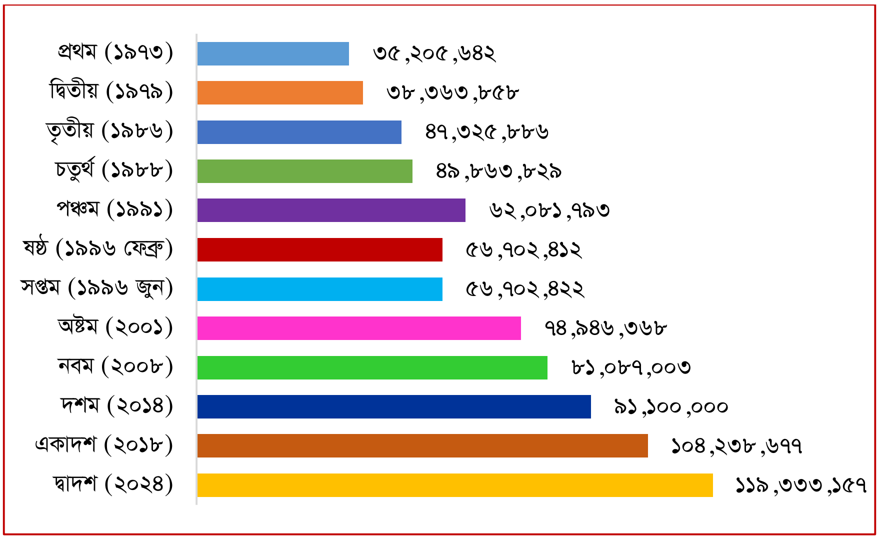

চিত্র ৪: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিঙ্গভেদে ভোটার (শতাংশ)

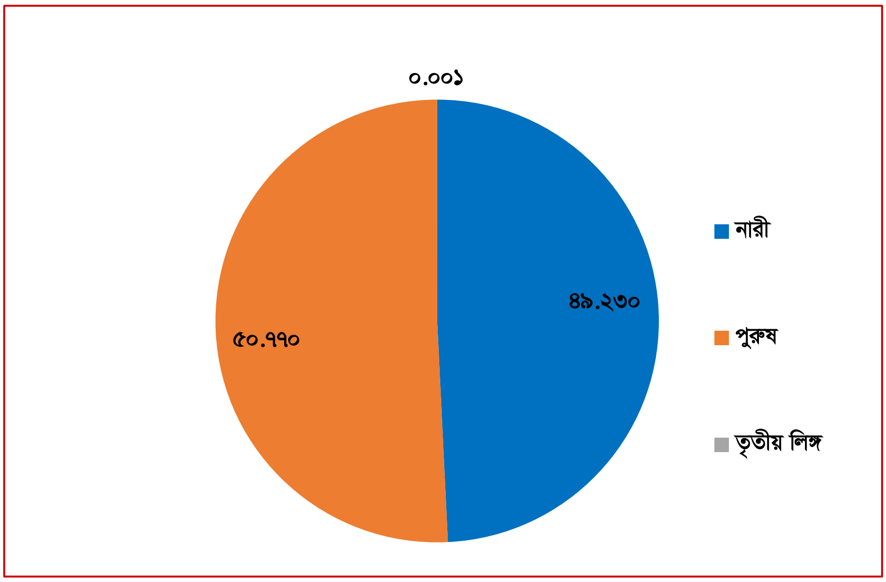

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস: জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় শেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনের আগে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করলেও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক ও ভৌগলিক অখণ্ডতা বিবেচনায় অধিকাংশ আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। জটিলতা নিরসনে ২০২১ সালে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে দেশের কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তোলার সুযোগ না রেখে নির্বাচন কমিশনকে সীমানা নির্ধারণে অবারিত ক্ষমতা দিয়ে 'জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ' আইন পাস হয়। শেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনে মোট ১৯৮টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয় যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টিসহ স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মামলা ও বিবিধ আইনি জটিলতাও তৈরি হয়। ২০২৩ সালে নির্বাচন কমিশনের ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাবে ১৮৬টি আবেদন (৬০টি বহালের, ১২৬টি আপত্তি) পায় কমিশন। আসনভেদে জনসংখ্যার বৃহৎ পার্থক্য রেখে বিতর্কিতভাবে ১০টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গাইডলাইন অনুসারে সর্বোচ্চ জনসংখ্যার আসনের সাথে সংশ্লিষ্ট আসনে গড় জনসংখ্যার কম বেশি ৫ শতাংশ পার্থক্য রেখে সীমানা নির্ধারণের মানদণ্ড থাকলেও বাংলাদেশে ২৬ থেকে ৮৮ শতাংশ রেখে নির্ধারণ করা হয়। ফলে কিছু আসনের ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ লাখের অধিক। অন্যদিকে, একই জেলার অন্য আসনের ভোটার সংখ্যা ৩ লাখের কম। ভোটার সংখ্যার বৃহৎ ব্যবধানের কারণে প্রার্থীদের আসনভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয়সহ অন্যান্য কার্যক্রমে জটিলতা তৈরি হয়।

সারণি ৫: সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়

নির্বাচন	সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়	পুনর্বিন্যাসকৃত আসন সংখ্যা
নবম (২০০৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৩৩টি
দশম (২০১৪)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৪০টি
একাদশ (২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	২৫টি
দ্বাদশ (২০২৪)	প্রশাসনিক ও ভৌগলিক অখন্ডতা	১০টি

নতুন দলের নিবন্ধন: ২০২২ সালে মে মাসে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান করে নির্বাচন কমিশন। নিবন্ধন পেতে ৯৩টি দল অবেদন করে। প্রাথমিক বাছাইয়ে ১৮টি আবেদন বাতিলের সুপারিশ করা হয় ও ২টি প্রত্যাহার করা হয়। ১৫ দিন সময় দিয়ে ৭৭টি দলকে বিস্তারিত নথি প্রদানের নোটিশ প্রদান করে কমিশন। এর মধ্যে ১২টি দলকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্যের গড়মিলের যুক্তিতে ১০টি দলকে নিবন্ধন দেয়নি নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে 'কিংস পার্টি' অভিহিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) নামে ২টি নতুন দলকে নিবন্ধন প্রদান করে কমিশন। স্থানীয় পর্যায়ে অফিস না থাকা, মাঠ পর্যায়ে দল দুইটির তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করাসহ নিবন্ধনের শর্ত পূরণ এবং যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে, কয়েকটি দলের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। এছাড়া, নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে মোট ১৪টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে কমিশন। অন্যদিকে, আইনের ধারা স্পষ্টিকরণের যুক্তিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে কমিশন আরপিও সংশোধনের প্রস্তাব করে এবং আরপিও সংশোধনের ফলে কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হলেও কমিশন সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নেয়। আরপিও-এর ৯১(ক) ধারা সংশোধন ('নির্বাচন' শব্দের স্থানে 'ভোট গ্রহণ' স্থাপন) করে ৯১(কক) নামে নতুন উপধারা (পুরো আসনের ভোটের ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করার বিষয় বাদ দিয়ে উপধারা অনুমোদন) সংযোজন করা হয়। এই সংশোধনীর ফলে কমিশনের একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা হারায় এবং অনিয়মের অভিযোগে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ (পোলিং) বাতিল করার ক্ষমতা থাকে। এছাড়া, ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের জন্য সুযোগ বাড়ানো এবং মনোনয়নপত্র জমার আগের দিন পর্যন্ত ব্যাংকঋণ ও বিভিন্ন পরিষেবার বিল পরিশোধের অনুলিপি জমা দেওয়ার সুযোগ রাখার মাধ্যমে ঋণখেলাপি ও বিলখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।

নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু করতে সংবিধানে প্রদত্ত ১২৬ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বা ম্যান্ডেট রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানে ব্যবহার করেনি কমিশন। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন ও পুরাতন রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতারসহ রিমান্ড জামিন নামঞ্জুর ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপির তালাবদ্ধ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে কমিশন সংলাপের আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে।

"সম্ভাব্য পোলিং এজেন্টদের তালিকা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার পর যদি তাদের গ্রেফতার করা হয়, তাহলে বুঝবো সেটি বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে ....পোলিং এজেন্টদের গ্রেফতার করলে ছয় মাস আগে করুন, না হলে নির্বাচনের পরে করুন"----

বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার

নির্বাচন কমিশন ও কমিশনের কর্মকর্তারা বিতর্কিত, স্ব-বিরোধী এবং ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এরকম কয়েকটি বক্তব্য হলো-

- "নির্বাচনের পরিবেশ নেই, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা"
- "২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের বিতর্কের চাপ কমিশনের ওপর পড়ছে"
- "সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের সব ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন"
- "ভোটারের অংশগ্রহণই অংশগ্রহণমূলক"
- "এক শতাংশ ভোট পড়লেও নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ" ইত্যাদি

আচরণবিধি ভেঙ্গে নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগেই ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন প্রস্তুতি ও প্রচারণা, আগ্রহী প্রার্থীদের মিছিল, শোডাউন ও সভা-সমাবেশ করা, সম্ভব্য প্রার্থীদের পোস্টার-ব্যানার টানানো ইত্যাদি হলেও নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। "আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তারা চূড়ান্ত প্রার্থী নয়" বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দায় এড়ানো হয়।

সংলাপের প্রাপ্ত সুপারিশ আমলে নিতে নির্লিপ্ততা: সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে আইন ও প্রয়োজনে সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করা এবং এ সংক্রান্ত ভূমিকা না রাখার অভিযোগ রয়েছে। আরপিও-সংশ্লিষ্ট ১৭টি ধারা কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশোধনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংলাপে প্রাপ্ত রাজনৈতিক এবং সংবিধান বিষয়ক সুপারিশগুলো সংশোধনের জন্য সেই প্রস্তাবে যুক্ত করা হয়নি। সংবিধানের ১২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনকে সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা থাকলেও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সংস্কারে কমিশন সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রস্তাব/সুপারিশ প্রদান করেনি।

নির্দিষ্ট এজেন্ডা ছাড়াই রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। ফলে বিএনপিসহ ১৮টি রাজনৈতিক দল সংলাপ বর্জন করেছে। সংলাপ বর্জনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কমিশনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে ঘাটতি- নির্বাচনকলীন সরকার, নির্বাচনকালে মন্ত্রণালয়গুলোকে কমিশনের অধীনে আনা, বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হয়রানি মামলা বন্ধ, ভোট কক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের চাপে ভোটকক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে ইভিএমএর ব্যবহার ও ক্রয়কে কেন্দ্র করে কমিশনের বিতর্কিত এবং বিপরীতমুখী অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া, বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সংলাপে আসা বাস্তবায়নযোগ্য পরামর্শ ও সুপারিশগুলো আমলে নেওয়া হয়নি।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিবন্ধন: নিবন্ধন কার্যক্রমেও স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ৯৬টি দেশি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতা যাচাই-বাছাই করা হয়নি। পর্যবেক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা না থাকা এবং দলীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে তালিকাভুক্ত করার তথ্য গণমাধ্যমে এসেছে। এছাড়া, বিদেশি পর্যবেক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আসল-নকল দেখার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বলে নির্বাচন কমিশন দায় এড়িয়েছে।

বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত: অধিক সংখ্যক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি কমিশন। মাত্র ৯টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে অস্পষ্টতাসহ প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সুপারিশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ মিশন না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডাসহ কয়েটি দেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

সারণি ৬: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	দেশী পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষক সংখ্যা (জন)	আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক (জন)
২০০১ (অষ্টম)	৬৯	২,১৮,০০০	২২৫
২০০৮ (নবম)	১৩৮ (৭৫টি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ)	১,৫৯,১১৩	৫৯৩
২০১৪ (দশম)*	-	-	-
২০১৮ (একাদশ)	৮১	২৫,৯০০	১৬৯
২০২৪ (দ্বাদশ)	৯৬ (৮৪টি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ)	২০,৭৭৩	১২৭

* তথ্য পাওয়া যায়নি

৭.২. প্রাক-নির্বাচনী সময়: অন্যান্য অংশীজন ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

ক্ষমতাসীন দলের ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে রাজনৈতিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা তৈরিসহ বিরোধী দলকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কৌশল গ্রহণ করা হয়। সভা-সমাবেশে বিবিধ শর্ত প্রদান, গ্রেফতার ও রাজনৈতিক হয়রানি মামলা প্রদানসহ বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের দ্রুততার সাথে বিচার ও সাজা প্রদানে রাতে বিচার কার্য পরিচালনা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭১টি মামলায় ৪০ লাখ জনকে আসামি করার তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিএনপি'র অভিযোগ অনুযায়ী জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২৭ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১১ হাজার মামলায় ৯৮ হাজার ৯৫৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। তফসিল ঘোষণার আগে বিরোধী দলের সক্রিয় ও নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নামে নতুন এবং পুরাতন মামলায় গ্রেফতার ও সাজা প্রদান এবং এসকল কাজে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। চাপ প্রয়োগ করে বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে আনার কৌশল এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্তে নেতাদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রস্তাব প্রদানের তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

নতুন দল গঠন ও তাদের কার্যক্রম: অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখাতে নতুন দল গঠন এবং বিরোধীদলের সাবেক নেতাদের নেতৃত্বে নতুন দল তৈরিসহ কিছু ছোট দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, সরকারের সহায়তায় নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের নিয়ে নতুন দুইটি দল ('কিংস পার্টি') গঠনের অভিযোগ রয়েছে। তফসিল ঘোষণার পর এধরনের দলের ছোট পরিসরের প্রধান কার্যালয় হঠাৎ করে রাজধানীর অভিজাত এলাকার বিলাসবহুল ভবনে বড় পরিসরে স্থানান্তর, স্থানীয় পর্যায়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের ব্যয়ভার ও কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভাড়াসহ খরচ বহনের বিষয়ে অস্পষ্টতা ও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। বিরোধী নেতাদের নতুন নিবন্ধিত দলে যোগদানে আর্থিক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনসহ ক্ষেত্রবিশেষে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও গ্রেফতার করা হয়েছে। নতুন নিবন্ধিত দলে যোগদানে অস্বীকৃতি জানানো নেতাদের চরিত্র হনন হয় এমন অডিও প্রকাশ করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সাথে দল দুটির নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন এবং নির্বাচন নিয়ে সরকারের সহায়তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। দল দুইটির নিজস্ব নেতা-কর্মীর স্বল্পতা ও অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই দুইটি দল থেকে মনোনয়ন গ্রহণসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়। বিএনপিসহ সরকার বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে এবং ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়া এবং ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বানসহ হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে।

৭.৩ প্রাক-নির্বাচনী সময়: নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণা করে। মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় ছিল ৩০ নভেম্বর ২০২৩।

সারণি ৭: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ধাপ

ক্রম	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ	সময়সীমা	সংখ্যা
১	নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত দল	-	২৮টি
২	নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা	১৫ নভেম্বর, ২০২৩	-
৩	মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়	৩০ নভেম্বর, ২০২৩	২,৭১৬ জন
৪	যাচাই-বাছাই	১-৪ ডিসেম্বর, ২০২৩	-
৫	মনোনয়নপত্র বাতিল *	”	৭৩১ জন
৬	মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল	৬-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩	৫৬১ জন
৭	আদালতের রায়ে প্রার্থীতা ফেরত	”	৭৬ জন
৮	প্রার্থীতা প্রত্যাহার	১৭ ডিসেম্বর ২০২৩	৪৫৭ জন
৯	বৈধ মনোনয়নপত্র	”	১,৯৭৯ জন
১০	দলীয় প্রার্থী	-	১,৫৩৩ জন
১১	স্বতন্ত্র প্রার্থী	-	৪৪৬ জন
১২	প্রতীক বরাদ্দ	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩	-
১৩	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারি ২০২৪	১৮ দিন
১৪	নির্বাচনের দিন	৭ জানুয়ারি ২০২৪	১,৮৯৫ জন

৭.৪. আবেদন গ্রহণ ও প্রার্থীর হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী ১ হাজার ৯৭৯ জন, যার মধ্যে ২২ শতাংশের অধিক স্বতন্ত্র (৪৪৬)। হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী-

- সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী (৫৭ শতাংশ) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোটিপতি (১৬৪ জন) প্রার্থীর অংশগ্রহণ;
- ১৫ বছরের ব্যবধানে অনেক প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি;
- কোটিপতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি-শতকোটি টাকার মালিক এমন প্রার্থী ১৮ জন;
- প্রার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নামে বৈধ সীমার (৩৩ একর) বেশি (সর্বোচ্চ ৮১৩ একর) ভূমির মালিকানা থাকা;
- ২৭ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ বা দায় থাকা;
- অংশগ্রহণকারী ১৭০ জন প্রার্থীর নামে মামলা থাকা উল্লেখযোগ্য।

আইন অনুযায়ী হলফনামায় ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলে প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার কথা থাকলেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়নি। প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ এবং দায় বিবরণীসহ অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং আয় এবং সম্পদ কতোটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি।

মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ২ হাজার ৭১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে ৭৩১ জনের প্রার্থিতা বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। মনোনয়নপত্র বাতিলের পর বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৮৫ জন। অধিকাংশ মনোনয়ন রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাথমিক বাছাইয়ে এবং কিছু সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর আপিলের কারণে বাতিল হয়েছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে- ঋণ ও বিল খেলাপি, অসম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র দাখিল, হলফনামায় তথ্য গোপন, অসত্য তথ্য প্রদান, দলের কমিটি নিয়ে বিরোধ, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এক শতাংশ ভোটারের তালিকায় ভুয়া স্বাক্ষর, দ্বৈত নাগরিকত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭.৫. প্রার্থী মনোনয়ন

পেশাজীবি ও তারকাখ্যাতি প্রাপ্ত ব্যক্তিসহ পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দলীয় মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। সাবেক সরকারি কর্মকর্তা যেমন চিকিৎসক, সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা, আমলা, পূর্বে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রায় ১৫০ জন সদস্যর আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তির আবেদন করে। এর মধ্যে ৪০ জনকে দলীয় মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া, তারকাখ্যাতি প্রাপ্ত ক্রিকেটার, অভিনেতা ও শিল্পীদেরও মনোনয়ন প্রদান করা হয়। তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসৃত না হওয়া এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সব প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। অতীতে দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হলেও পারিবারিক, সরকারি চাকরি এবং তারকাখ্যাতির সূত্রে মনোনয়ন লাভসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিএনপিসহ ১৫টি নিবন্ধিত দলের অনুপস্থিতি ও তাদের নির্বাচন বর্জনের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি, নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং উৎসবমুখর দেখাতে ক্ষমতাসীন দল বিবিধ কৌশল গ্রহণ করে। সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি এবং জোটভুক্ত কয়েকটি দলের সাথে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ আসন ভাগাভাগি ও সমঝোতা করে। স্বতন্ত্র এবং জোটের মধ্যে থেকে অনুগতদের বিরোধী দল হিসেবে রাখার কৌশলও অবলম্বন করা হয়। জোটভুক্ত না হলেও কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে জাতীয় পার্টির জন্য ২৬টিসহ মোট ৩২টি আসন থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

চিত্র ৫: সাবেক সরকারি কর্মকর্তা-তারকা-শিল্পীদের দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তি (জন)

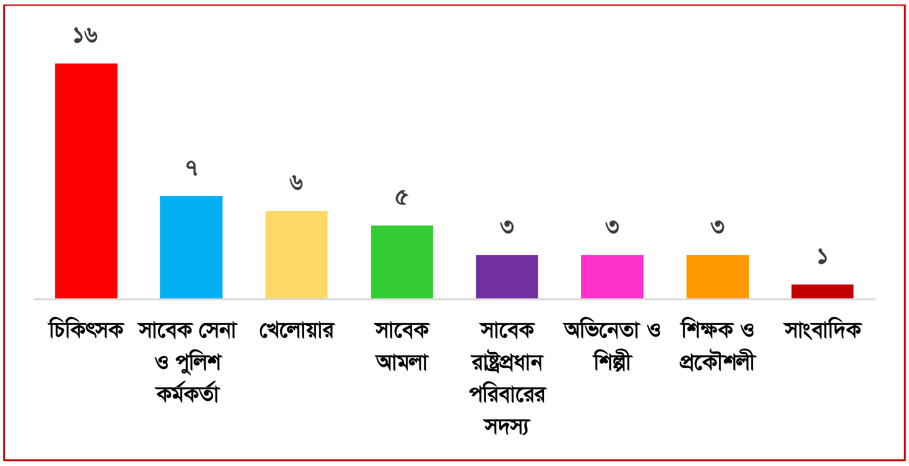

এছাড়া, প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয় এবং উৎসাহিত করা হয়। আসন ভাগাভাগি ও সমঝোতার পাশাপাশি প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখাসহ দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে নিজ দলের মনোনয়ন বঞ্চিতদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীর চেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী বেশি ছিলো। ২৬৬ জন দলীয় প্রার্থীর বিপরীতে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলো ২৬৯ জন। জোটসহ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন

পাওয়া প্রার্থীরা নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রদানের বিরোধীতা করে। দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে প্রচারণা পর্যায়ে সহিংসতায় ৩ জনের প্রাণহানি হয়।

৮. নির্বাচনকালীন সময়

প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি: ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিতে জোর প্রদান করা হয়। এর অংশ হিসেবে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী আনসার ভিডিপি'র সদস্যসহ নির্বাচন গ্রহণ সংশ্লিষ্টদের পরিবারের সদস্যদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া নিশ্চিতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ভোটকেন্দ্রে যেতে এবং ভোট প্রদানে সাধারণ ভোটারদের ওপর অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সরকারি সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বন্ধের হুমকিও প্রদান করা হয়। ক্ষমতাসীন দলের সভায় না এলে, ভোট কেন্দ্রে না গেলে এবং নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট না দিলে নির্বাচনের পর সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ভাতা, ভাতার কার্ড এবং সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া; নৌকায় ভোট না দিলে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সংযোগ বন্ধ করাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং সিটি কাউন্সিল কর্মকর্তা কর্তৃক জনগণকে বিবিধ সেবা বন্ধের ভয় দেখানো হয়। কার্ডপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধাভোগীর কার্ড জব্দ করার কথাও বলা হয়। ভোট কেন্দ্রে না গেলে বিএনপিসহ বিরোধী দলের সমর্থকদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়।

সরকারি কর্মকর্তাদের চাকুরি বিধি ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন: সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য ও পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়াসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনে এবং নির্দিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়ী করতে বিবিধ বক্তব্য প্রদান করেছে। পুলিশ কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের ভোটকেন্দ্রে ভোটার হাজির করানোর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানোর অভিযোগ রয়েছে। চাকুরি বিধি ভেঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ; রিটার্নিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রচারণা ও ভোট চাওয়াসহ নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নানা অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রী, এমপিসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সাবেক আমলা ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রচারণায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সরাসরি অংশগ্রহণেরও তথ্য পাওয়া গেছে। নির্বাচন ও প্রচারণায় সরকারি স্থাপনা ও সম্পদ ব্যবহারসহ কয়েকজন মন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাদের নির্বাচনী সংবাদ প্রেরণে যুক্ত থাকার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচারণা, সংবাদ প্রেরণসহ বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণেরও নানা অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ায় সরকারি চাকুরিবিধি ভঙ্গ হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয় কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন নমনীয় ভূমিকা পালন করে। কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি চাকুরিজীবীদের বদলির সুযোগের ঢালাও ব্যবহার করে জেলা প্রশাসকসহ সরকারি কর্মকর্তা বদলি করা হয়েছে এবং কমিশন কর্তৃক সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় আচরণবিধি প্রতিপালন: মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, এমপি এবং দলীয় মনোনীত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক বিবিধ আচরণবিধির লঙ্ঘন করা হয়। তফসিল ঘোষণার আগেই নির্বাচনী প্রচারণা, শোডাউন করে মনোনয়ন জমা, নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ, জনসংযোগ এবং পথসভায় মাইক ব্যবহার করে ভোট চাওয়া হয়। আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে পদাসীন সংসদ সদস্য কর্তৃক অধিক আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। ৭ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি বিবিধ অভিযোগে ৭৪৬টি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। এর মধ্যে ৯১জন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে; ৫২ জন বর্তমান সাংসদ, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে এবং ১৫৩ জন স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য প্রার্থীকে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি'র আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় তদন্ত করার এখতিয়ার ছিলো না এবং তারা শুধু কমিশনকে শুধু সুপারিশ করতে পারে। প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্বাচনী অপরাধ আমলে নিয়ে তা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের মাধ্যমে ৬১টি মামলা নিষ্পত্তি ও বিভিন্ন ধরনের দন্ড প্রদান করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর (আওয়ামী লীগ) মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা, কর্মী ও সমর্থকের বাড়িতে হামলা, গুলি ও আগুন দেওয়া, গাড়িবহরে হামলা, ক্যাম্পে হামলা, প্রচারে বাধা প্রদান, পোস্টার ছেঁড়া, যানবাহন ভাঙচুর করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণা কালে মোট তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। নারীসহ স্বতন্ত্র প্রার্থী ও প্রার্থীর কর্মীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গুলি ও হামলা করা, আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার, প্রশাসনসহ পুলিশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা, স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য প্রার্থী ও তার কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ আমলে না নেওয়া এবং থানায় মামলা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ৬: নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক আচরণবিধি ভঙ্গকারী প্রার্থীদের নোটিশ প্রদান (অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যা)

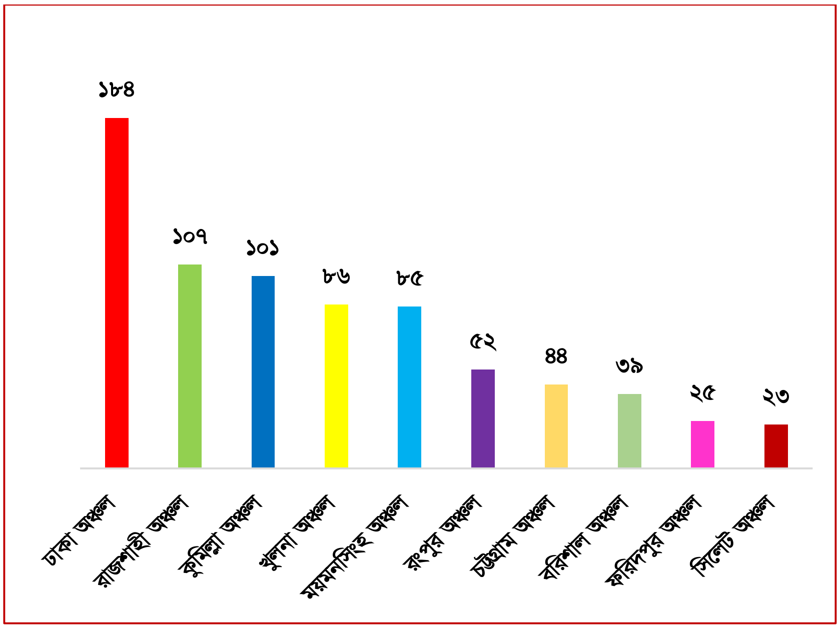

অর্থ ও পেশী শক্তি নিয়ন্ত্রণ: বিভিন্ন আসনে প্রার্থী এবং প্রার্থীর নেতা-কর্মীরা অবৈধ অর্থের লেনদেন করেছেন, সাংবাদিক এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিছু আসনে অর্থের বিনিময়ে ভোটক্রয়সহ অবৈধ অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের এমপি এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে। প্রতিযোগীতার সমান ক্ষেত্র না থাকায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অর্থের প্রভাবের কাছে টিকতে না পেরে জোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো চিত্র দেখা গেছে। সার্বিকভাবে, অবৈধ অর্থ ও পেশীশক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সহিংসতা বন্ধে পুলিশ এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততাসহ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সীমিত অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার: দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার হয়েছে। প্রার্থী কর্তৃক মোবাইলে এসএমএস প্রদান করে সরকারের বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারণা, ডিজিটাল ক্যাম্পেইনসহ ফেসবুক ও সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে। কিছু আসনের প্রার্থী ফেসবুকে প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করেছে। প্রচারণার সময় শেষ হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত ছিল। নির্বাচনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এর ব্যবহার এবং ডিপ ফেইকের মাধ্যমে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা হলেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, আরপিওতে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা এবং এ সংক্রান্ত খরচ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধি নিষেধ নেই। এছাড়া, নির্বাচনী প্রচারণায় লেমিনেটেড প্লাস্টিক পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক এমন পোস্টার ব্যবহার না করার বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করলেও তা অমান্য করা হয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়: দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেসরকারি চাকরজীবী ও প্রশাসন থেকে মোট ৯ লাখ ৯ হাজার ৫২৯ জন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনী থেকে মোট ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৩২২ জন সদস্য নিয়োজিত ছিলো। তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ১ হাজার ৪৫৫ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ৩০০টি নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়।

ভোটকেন্দ্র: সারাদেশে ৪২ হাজার ২৪টি ভোটকেন্দ্র ও ২ লাখ ৬১ হাজার ৫৬৫টি ভোট কক্ষ স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ১০ হাজার ৩০০টি কেন্দ্র (২৪.৪%) ঝুঁকিপূর্ণ (অতি গুরুত্বপূর্ণ) হিসেবে নির্বাচন কমিশন চিহ্নিত করে।

নির্বাচনের ব্যয়: নির্বাচনের মোট বাজেট ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা হলেও ব্যয় বেড়ে ২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা হওয়ার তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বাজেট ছিল ৭০০ কোটি টাকা, ২০১৪ সালে ৩০০ কোটি টাকা এবং ২০০৮ সালে ২০০ কোটি টাকা।

- একাদশ জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় তিনগুণ খরচ বৃদ্ধি- “সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন” বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত;

- অতীতের নির্বাচনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে আসা নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের একদিনের জন্য সম্মানী/ভাতা দেওয়া হলেও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের দুই দিনের, ম্যাজিস্ট্রেট ও সম-ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পাঁচ দিনের এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য ১৩ দিনের সম্মানী/ভাতা প্রদান;
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য মোট নির্বাচনী বাজেটের অর্ধেকের বেশি (৫৪ শতাংশ) খরচ করা হলেও এর সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা না থাকা; এবং
- নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সম্মানী/ভাতা বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি।

গণমাধ্যমে প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন: নির্বাচনী প্রচারণাকালীন সময় ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রীয় টিভি'র একচেটিয়া ব্যবহার করে। ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদে মোট সময় ব্যয়িত হয়েছে ৪৯৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড এবং এ বাবদ প্রাক্কলিত মোট আর্থিক মূল্য ৪ কোটি ৪২ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা। বিটিভি'কে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দলের প্রচার-প্রচারণা ও সভা-সমাবেশের খবর প্রচার করে। নির্বাচনে অনুমোদিত প্রচারণার সময় সীমার মধ্যে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং কমিশনের সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার সক্ষমতা সংক্রান্ত খবর প্রচার ছিল উল্লেখযোগ্য।

সারণি ৮: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য

	পর্যায়				
	প্রচারণার অনুমোদিত সময়ের পূর্বে (৫ ডিসেম্বর ২০২৩ - ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	প্রচারণার অনুমোদিত সময়কালে (১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৫ জানুয়ারী ২০২৪)	মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত* মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	প্রাক্কলিত* মোট আর্থিক মূল্য (শতাংশ)
	(১)	(২)	(১+২)		
প্রধানমন্ত্রী	১৭ মিনিট ৫৫	৮৯ মিনিট ২৫	১০৭ মিনিট ২০	৯৬,৬০,০০০	২১.৮
সড়ক পরিবহন ও সেতু	৫০ মিনিট ১৬	৬৫ মিনিট ৩৫	১১৫ মিনিট ৫১	১,০৪,২৬,৫	২৩.৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	৪৩ মিনিট ১৪	৬৩ মিনিট ৫৬	১০৭ মিনিট ১০	৯৬,৪৫,০০০	২১.৮
নির্বাচন কমিশন	৯ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড	৩৩ মিনিট ৫১ সেকেন্ড	৪৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৩৯,২৮,৫০০	৮.৯
নির্বাচনী প্রচারণা (অন্যান্য)**	৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড	৯৫ মিনিট ২০ সেকেন্ড	৯৯ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড	৮৯,৯২,৫০০	২০.৩
অন্যান্য দল সম্পর্কিত সংবাদ	১ মিনিট	১৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড	১৭ মিনিট ২২ সেকেন্ড	১৫,৬৩,০০০	৩.৫
মোট	**১২২ মিনিট ২৭ সেকেন্ড**	**৩৭১ মিনিট (৬ ঘণ্টা ১১ মিনিট**	**৪৯৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড**	**৪,৪২,১৫,৫০০**	**১০০.০**

*বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে এই প্রাক্কলন করা হয়েছে।
* * নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কিত ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য প্রচারে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রাধান্য পেয়েছে।

বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোর ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক অবস্থান গ্রহণ: বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোতে হরতাল-অবরোধ-অগ্নিকান্ড ও নির্বাচন বর্জনের খবরসহ বিএনপি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি এই বিষয়ক সরকার দলীয় নেতাদের বক্তব্য অধিক প্রচার করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচার এবং নির্বাচনে নৌকা ও আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারণার আধিক্য ছিলো। বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোর খবরে প্রতিযোগিতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং উৎসবমুখর নির্বাচনী পরিবেশের চিত্র উপস্থাপন করা

হয়েছে। তারকাখ্যাতি সম্পন্ন প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদের বহুল প্রচার হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার সক্ষমতা সংক্রান্ত খবরও প্রচার করা হয়েছে।

নির্বাচন অনুষ্ঠান: একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত করায় মোট ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটের দিন বিকাল তিনটা পর্যন্ত ২৬.৩৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানানো হয় নির্বাচন কমিশন থেকে। পরবর্তী এক ঘন্টায় আরও ১৫.৪৩ শতাংশ ভোটসহ মোট ৪১.৮ শতাংশ ভোট পড়ার ঘোষণায় ভোট প্রদানের ঘোষিত হার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। নির্বাচনে নানাবিধ অনিয়মের অভিযোগে ১৩টি আসনে ৪২ জন প্রার্থী ভোট বর্জন করে। এর মধ্যে ৫টি আসনে জাতীয় পার্টি এবং ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোট বর্জন করে। নির্বাচনের আগের দিন রাতে ১৪ জেলায় ২১টি কেন্দ্রে অগ্নি সংযোগ করে দুবৃত্তরা। বিএনপি কর্তৃক নির্বাচনের দিন হরতাল ডাকা হয় এবং নির্বাচন প্রতিহত করাসহ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া আহ্বান জানানো হয়। নির্বাচনের দিন ৬টি জেলায় সহিংসতা হয় এবং ১ জন নিহত হয়। ৯টি আসনের ২১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। অন্যদিকে, একটি আসনের একটি কেন্দ্রে অনিয়মের কারণে ফলাফল স্থগিত করা হয় এবং উক্ত কেন্দ্রে পরবর্তীতে পুনরায় ভোট গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের ৪ জন, আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র ১৫ জন, নৌকা প্রতীকে ভোট করা শরিক দলের ২ জন ও জাতীয় পার্টির (জাপা) ২৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ করেন। অনিয়মের কারণে ময়মনসিংহ ৩ একটি আসনের ফলাফল স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। পরবর্তীতে নওগাঁ'র একটি আসনে নির্বাচনসহ ময়মনসিংহ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয়ী হয়।

সার্বিকভাবে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৪টি, স্বতন্ত্র ৬২টি, জাতীয় পার্টি ১১টি, কল্যাণ পার্টি ১টি, ওয়ার্কার্স পর্টি ১টি, এবং জাসদ ১টি আসনে জয়ী হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, আওয়ামী লীগ ৬৫ শতাংশ, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৪ শতাংশ এবং জাতীয় পার্টির ৩ শতাংশ ভোট পায়। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক দেখাতে নিজ দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করলেও বেশিরভাগ আসনেই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি। গণমাধ্যমে ২৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভোট পড়ার সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৯৯টি আসনে বিজয়ী প্রার্থীর সাথে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের গড় ৮২ হাজার ৫৯৩। এই আসনসমূহে বিজয়ী প্রার্থীর সাথে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের গড় ১ লাখ ৩১৪। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ভোট ব্যবধান ১৯ হাজার ৬৬, সর্বোচ্চ ব্যবধান ২ লাখ ৯৩ হাজার ৭৮০। এছাড়া ২৪১টি আসনে ভোট পড়ার সংখ্যার সাথে বিজয়ী প্রার্থী ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর ভোট ব্যবধানের তুলনামূলক বিশ্লেষনে দেখা যায়, ভোট ব্যবধানের সংখ্যা প্রদানকৃত ভোটের ৫৭ শতাংশ।

সারাদেশে অধিকাংশ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্য দলের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিলো না। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকি প্রদানের মাধ্যমে অন্য দলের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখার তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া, স্বল্প ভোটার আগমন এবং ডামি লাইন তৈরি, বিভিন্ন আসনে অন্য প্রার্থীর এজেন্ট বের করে দেওয়া, ভোটের আগেই ব্যালটে সিল মারা, ভোট চলাকালে প্রকাশ্য সিল মারাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ ও তার জোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। নির্বাচনের আগের দিন এবং নির্বাচনের দিন তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণসহ ৪টি পত্রিকার অনলাইন প্রবেশগম্যতা ও তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। জাপান, রাশিয়া, চীন ও ভারতসহ কয়েকটি দেশের পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল হয়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসংঘ ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমে নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে।

৯. নির্বাচন-পরবর্তী সময়

নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত এবং সহিংসতা: নির্বাচনের পর ৪১টি জেলায় মোট ৩৪৫টি নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রতিপক্ষ নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারের চার শতাধিক বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট- ৭ জন নিহত ও ৬৯৬ জন আহত হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও বেদেসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা; ভোট দিতে না যাওয়া, প্রতিপক্ষের হয়ে নির্বাচনে প্রচারণা চালানো, প্রতিপক্ষকে ভোট প্রদান হামলার অন্যতম কারণ। প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীরা এসব ঘটনা প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেন।

নির্বাচনী অভিযোগের তদন্ত এবং নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি: প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মোট ৭৪৬টি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে। এর মধ্যে ১৫০ জনের অধিক আওয়ামী লীগ প্রার্থী, যার মধ্যে ৮০ জন একাদশ সংসদের সংসদ সদস্য। নির্বাচনের পর পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও ৩১১টি অভিযোগের তদন্ত হয়নি। নির্বাচন শেষ হওয়ায় অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কমিশনের কম গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে বলে গণমাধ্যমে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল: নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দল নির্ধারিত সময়ে ব্যয় বিবরণীর সত্যায়িত নথি কমিশনে জমা প্রদান করেনি। এর ফলে গণপ্রতিনিধত্ব আদেশ অমান্য হলেও কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং জমাকৃত ব্যয়ের বিবরণী কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেনি।

১০. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে চিত্র

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মোট ৫০টি আসনের ১৪৯ জন প্রার্থীর ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীরা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছেন গড়ে ৩০ বছর (সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৫৭ বছর)। ১৮ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো না কোনো ফৌজদারী মামলা রয়েছে এবং তারা সকলেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী। এবং ৫৪ শতাংশ প্রার্থী পূর্বে কোনো জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

চিত্র ৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থী (জন)

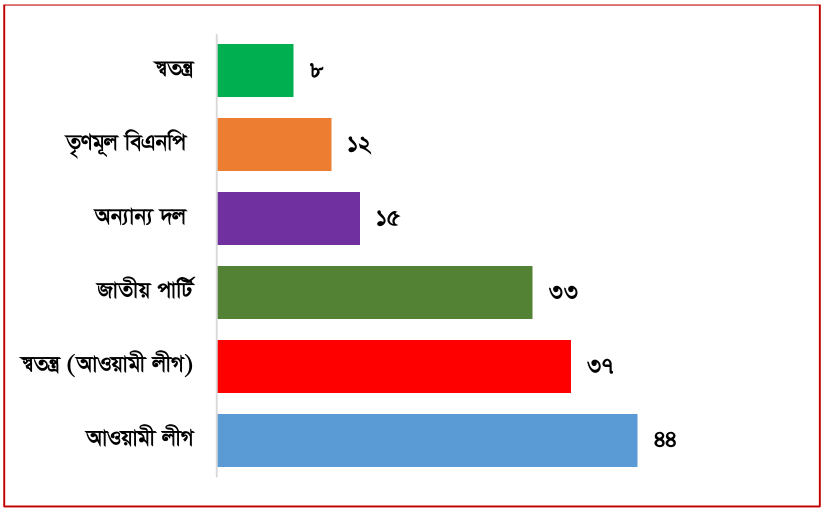

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন: আওয়ামী লীগ মনোনিত শতভাগ প্রার্থী কর্তৃক কোনো না কোনো নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ দলীয় স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য দলের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। ভঙ্গকৃত আচরণবিধির মধ্যে অন্যতম হলো-

- দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো;
- যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন, জনসভা ও শোভাযাত্রা করা;
- পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা; এবং
- নির্ধারিত সময়ের আগে প্রচারণা শুরু ইত্যাদি।

সারণি ৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন

রাজনৈতিক দল	ন্যূনতম একবার হলেও আচরণবিধি ভঙ্গ (প্রার্থী/শতাংশ)
আওয়ামী লীগ	১০০.০
স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	৯৭.৩
স্বতন্ত্র	৮৭.৫
জাতীয় পার্টি	৮৪.৯
অন্যান্য দল	৮০.০
তৃণমূল বিএনপি	৭৫.০

সারণি ১০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন (প্রার্থী/শতাংশ)

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন*	আওয়ামী লীগ (%)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	জাতীয় পার্টি (%)	তৃণমূল বিএনপি (%)	অন্যান্য (%)	স্বতন্ত্র (%)	মোট প্রার্থী (%)
দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	৭৯.৬	৭৫.৭	৫৪.৬	৪২.০	৪৭.০	৬২.৫	৬৬.০
জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি)	৮৮.৬	৭৩.০	৩৯.৪	২৫.০	২৭.০	৩৭.৫	৬০.০
পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৭৯.৬	৬৪.৯	৩৬.৪	১৭.০	২০.০	৫০.০	৫৪.০
ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	৬৫.৯	৭০.৩	৪২.৪	৩৩.০	২৭.০	২৫.০	৫৩.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৭২.৭	৫৯.৫	৩৩.৩	০	২০.০	৩৭.৫	৪৮.০
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	৫০.০	২৭.০	৩৩.৩	২৫.০	৪০.০	৭৫.০	৩৯.০
দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	৫০.০	৪৩.২	৩০.৩	৮.৩	২০.০	২৫.০	৩৬.০
যেকোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	৫০.০	৪৬.০	১৮.২	৮.৩	১৩.০	৩৭.৫	৩৪.০
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি	৫৯.১	৩৭.৮	১৫.২	০	০	৩৭.৫	৩২.০
প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৪৮.৮	৪৩.২	১২.১	০	৬.৭	৫০.০	৩১.০
ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৪০.৯	৪৮.৭	১২.১	০	০	২৫.০	২৮.০
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	৫৪.৬	২৪.৩	১২.১	০	৬.৭	৩৭.৫	২৮.০
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৪৭.৭	১৩.৯	৬.২৫	০	৬.৭	২৫.০	২১.০
গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	৫৩.৫	১৬.২	৩.০৩	০	৬.৭	০	২১.০
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৪৫.৫	১৮.৯	০	০	০	১২.৫	১৯.০
নির্বাচনের আগে কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	২৫.০	২৭.০	১২.১	০	০	১২.৫	১৭.০
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনী প্রতীক	৪৫.৫	১০.৮	৩.০৩	০	০	১২.৫	১৭.০

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন*	আওয়ামী লীগ (%)	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	জাতীয় পার্টি (%)	তৃণমূল বিএনপি (%)	অন্যান্য (%)	স্বতন্ত্র (%)	মোট প্রার্থী (%)
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন বক্তব্য	২০.৫	২৪.৩	৬.০৬	৮.৩	১৩.০	৩৭.৫	১৭.০
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা প্রচারাভিযানে বাধা	৩৮.৬	১৬.৭	০	০	০	২৫.০	১৭.০
সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন	৩০.২	১৩.৫	১২.১	০	০	০	১৫.০

চিত্র ৮: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের চিত্র

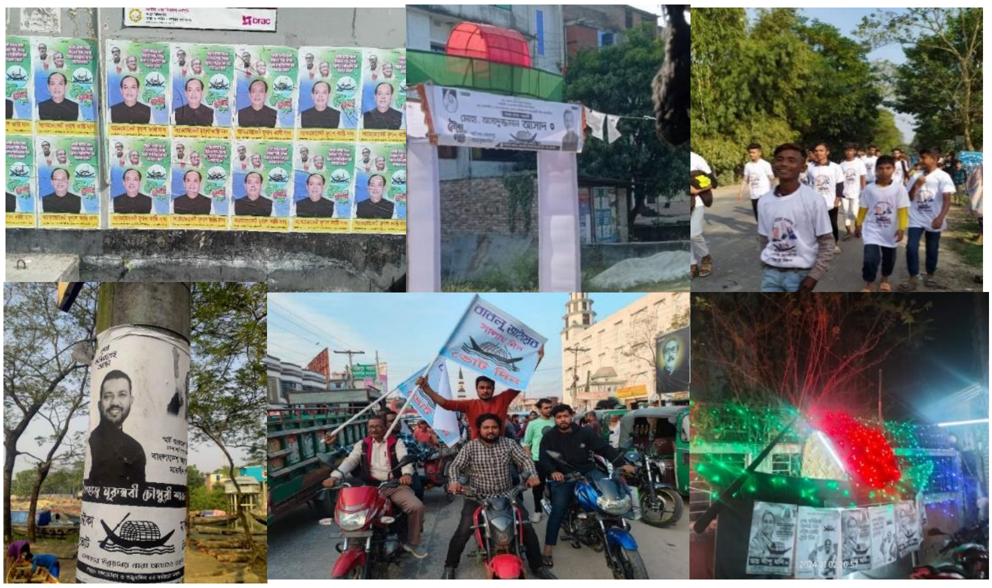

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শতভাগ আসনেই একাধিক অনিয়মের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিচের সারণীতে অনিয়মের ধরন এবং আসন ভিত্তিক শতকরা হার দেওয়া হলো-

সারণি ১১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন	আসনের শতকরা হার
বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা	৮৫.৭
সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত না করা	৮৫.৭
তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা	৭৭.৬
প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৭৫.৫
রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ	৬৫.৩
সংবাদিক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান	৬১.২
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	৫৫.১

বুথ দখল, প্রকাশ্যে সিল মারা, জাল ভোট প্রদান	৫১.০
প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত না করা	৫১.০
প্রতিপক্ষের ভোটারদের হুমকি বা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৪৯.০
ভোট গণনায় জালিয়াতি	৪২.৯
ভোট ক্রয় (নগদ টাকা প্রদান, ভোটের দিন পরিবহণ খরচ বহন ও খাবার প্রদান)	৩৮.৮
অন্যান্য	২৪.৫

তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয়: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৬৫.৭৭ (৯৮) শতাংশ প্রার্থী। সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা, গড়ে ১১.৪৫ গুণ বেশি। বিজয়ী প্রার্থীরা গড়ে ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৩৮ টাকা ব্যয় করেছেন (সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা, সর্বনিম্ন ১৬ লাখ ৪৫ হাজার টাকা)। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১৪৯ জন প্রার্থীর গড়ে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৬৫ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ১৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৮০০ টাকা, সর্বনিম্ন ৪৪ হাজার ৮০০ টাকা) করেছেন। সার্বিকভাবে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৭৭ টাকা (সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১০ হাজার ১৪৪ টাকা, সর্বনিম্ন ৭০ হাজার টাকা); যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (প্রার্থী প্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) ৬ গুণ বেশি।

সারণি ১২: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

ক্রম	রাজনৈতিক দল	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রচারণায় প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা)*
১.	আওয়ামী লীগ	১,৬৭,৮০,১০২ (৩৬)	১০,১৫,১৭৯ (৪৪)	১,৩৮,৭৮,৯৮৮ (৪৪)	২,৮৬,২৩,৩৪১ (৪৪)
২.	স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ)	১২,৯৮,২৯৮ (৩৩)	৬,৫৪,৯৮১ (৩৭)	১,৮২,৬৭,১১৯ (৩৬)	১,৯৫,৮৬,৩৩৬ (৩৭)
৩.	জাতীয় পার্টি	৩৬,০৪,০১৬ (২২)	৩,৮৩,৫১২ (৩২)	৪২,২৬,৪৩৯ (৩৩)	৭০,০১,০০৭ (৩৩)
৪.	তৃণমূল বিএনপি	২,০৯,৭৫০ (৪)	৬৫, ০৮৩ (১২)	৭,০১,৮২৯ (১২)	৮,৩৬,৮২৯ (১২)
৫.	অন্যান্য দল**	৯৮,২৫০ (৮)	৮৯,১৬৬ (১৫)	২২,২৯,২১৩ (১৫)	২৩,৭০,৭৮০ (১৫)
৬.	স্বতন্ত্র	৪,২৪,০০০ (৫)	৩,২৪,১৮৭ (৮)	৮৯,২৬,৩৬৩ (৮)	৯৫,১৫,৫৫০ (৮)
	মোট	**৬৭,৫৮,৮৯৭ (১০৮)**	**৫,৮০,৩১৪ (১৪৮)**	**১,০২,৭৭,২৬৫ (১৪৮)**	**১,৫৬,৮৩,৭৭৭ (১৪৯)**

নোটঃ সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় সকল পর্যায়ে পাওয়া যায় নি। প্রতিটি গড়ের ক্ষেত্রে নমুনার সংখ্যা প্রথম বন্ধনিতে দেওয়া হয়েছে। * প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা) হিসাবের ক্ষেত্রে যে সকল প্রার্থীর কোনো একটি পর্যায়ে প্রচারণা ব্যয় পাওয়া যায় নি সেক্ষেত্রে প্রচারণার ব্যয় 'শূণ্য' বিবেচনা করা হয়েছে। ** অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাসদ, জাকের পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি, সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণায়ও দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় তিনগুণ বেশি (৩১০.৬ শতাংশ) ব্যয় করেছিলেন। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমা যেখানে ছিল আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা, প্রার্থীরা ব্যয় করেছিলেন গড়ে ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় ছয়গুণ বেশি (৬২৭.৪ শতাংশ) ব্যয় করেছেন। প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, নির্বাচনী ক্যাম্প, জনসভা, কর্মীদের জন্য ব্যয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘনের ধারা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত: গবেষণাভুক্ত ১৬টি আসনে ৩০টি সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগ) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হামলা ও সংঘর্ষ হয়েছে। ভোট দিতে না যাওয়া, প্রতিপক্ষের হয়ে নির্বাচনে প্রচারণা চালানো, প্রতিপক্ষকে ভোট প্রদানের কারণে এসব হামলার ঘটনা ঘটে।

নির্বাচন পরবর্তী মামলা ও অভিযোগ দায়ের: নির্বাচন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অফিস নির্বাচন পরবর্তী মামলা ও অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেনি টিআইবি গবেষণা দলকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২টি আসনে মামলা হয়েছে। একটিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যর বিরুদ্ধে ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ভোট দান ও গোপনীয়তা রক্ষা না করায় মামলা হয় এবং পরবর্তীতে অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা না থাকায় পরাজিত প্রার্থীদের নির্বাচন পরবর্তী মামলায় আগ্রহী নয় বলে তথ্য প্রদান করেন।

নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল: নির্ধারিত সময়ে ৪৬টি আসনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ব্যয় বিবরণী জমা প্রদান করেনি। এসংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দিষ্ট না থাকার অযুহাতে স্থানীয় নির্বাচন অফিস গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি। আসন সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিসে ব্যয় বিবরণীর নথি জনসাধারণের কাছে প্রদর্শনের নির্দেশনা থাকলেও সেই নথি প্রদর্শন করা হয়নি। অন্যদিকে, জমাকৃত ব্যয় বিবরণীর নথি চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করলেও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদান করেনি।

১১. সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য

উল্লিখিত ফলাফলের ভিত্তিতে এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য হচ্ছে-

- একপাক্ষিক ও পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অবাধ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক হয় নি। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ সার্বিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশেগণতন্ত্র ওগণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত; গৌরবময়মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নের সাথে সাংঘর্ষিক;
- নির্বাচিনকালীন সরকার ইস্যুতে দুই বড় দলের বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানের কারণে অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন হয়নি। এবং এ বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানকেন্দ্রিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জিম্মিদশা প্রকটতর হয়েছে:
- ক্ষমতায় অব্যাহত থাকার কৌশল বাস্তবায়নের একতরফা নির্বাচন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যার আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে না বা হলেও টিকবে না। তবে এ সাফল্য¨ রাজনৈতিক শুদ্ধাচার, গণতান্ত্রিক ও নৈতিকতার মানদন্ডে চিরকাল প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে:
- গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অন্যতম উপাদানসমূহ, তথা অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সর্বোপরি সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের যে পূর্বশর্ত, তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয় নি:
- নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে, একতরফা নির্বাচনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনও অনুরূপ ভাবে একই এজেন্ডার সহায়ক ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়েছে বা লিপ্ত থেকেছে;
- নির্বাচনের নামে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দীর্ঘকাল যাবত চলমান সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক আদর্শের যে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে;
- অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীর সাথে একই দলের ‘স্বতন্ত্র’ ও অন্য দলের সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের যে পাতানো খেলা সংগঠিত হয়েছে, তাতেও ব্যাপক আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অসুস্থ ও সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে, যার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বাইরে রাজনৈতিক আদর্শ বা জনস্বার্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন;

- মুষ্টিমেয় কতিপয় আসনে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বব্যাপী পাতানো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের অর্ন্তদ্বন্দ্বের নমুনা-ম্যাপিং হয়েছে, যার একমাত্র ইতিবাচক দিক হিসেবে অনিয়ম-দুর্নীতি-অবৈধতার যেসব তথ্য বরাবর প্রত্যাখ্যাত ছিল, তা নিজেদের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মাধ্যমে যথার্থতা পেয়েছে;
- দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে;
- সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও একচেটিয়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ব্যাপকতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি-দখলের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনী অঙ্গীকার আরও বেশি অবাস্তব ও কাগুজে দলিলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে;
- সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের সম্ভাব্য সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যতটুকু আগ্রহ থাকবে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার মানদন্ডে সরকারের প্রতি জনআস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ও তার প্রভাব। একই সাথে ক্রমাগত গভীরতর হবে দেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ; এবং
- গণতন্ত্রকামী মানুষের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কী করণীয় ও বর্জনীয় তার বিশ্লেষণ, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অবনমনের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী কৌশল ও অভিনবত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেষ্ট-কেইস হিসেবে বিবেচিত হবে

****

পরিশিষ্ট ১:

সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চিহ্নিত মোট ১৪টি চ্যালেঞ্জ-

১. রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি
২. পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন
৩. ইভিএম-এর প্রতি আস্থা তৈরি
৪. অর্থ ও পেশীশক্তির নিয়ন্ত্রণ
৫. আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা
৬. সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী আচরণবিধি অনুসরণ
৭. নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে বিপক্ষ/প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী/সমর্থক/পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক কোনো রকমের বাধার সম্মুখীন না হওয়া
৮. জালভোট/ভোটকেন্দ্র দখল/ব্যালট ছিনতাই রোধ
৯. প্রার্থী/এজেন্ট ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে অবাধ আগমন
১০. পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি
১১. নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ প্রদান
১২. পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিতকরণ
১৩. পর্যাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিতকরণ
১৪. নিরপেক্ষ দেশী/বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়োজিতকরণ